সফিউদ্দীন আহমেদের ছাপচিত্র : নিরীক্ষা ও নদনের সমিলন

মো. বনী আদম*

সারসংক্ষেপ: সফিউদ্দীন আহমেদ বাংলাদেশের অধুনালী ছাপচিত্রকলার জনক বা পুরোধা ব্যক্তি। ছাপচিত্রকলার সকল মাধ্যমে তার অবদান বিচরণ দ্বারা বহিতা আর তেলরং চিত্রে তার সৃষ্টিশীলতার প্রাপ্তিশক্তি অনুভব করা যায়। জীবনরত্ন বিষয়ে সমৃদ্ধ তার চিত্রসম্বন্ধ। সমাজের প্রাক্তন জনগোষ্ঠীর জীবনকালের প্রতিফলন তার চিত্রসমূহে। অগ্র আর মাধ্যমের নানা পরিক্ষা-নিরিক্ষা শিল্পী ব্যাপৃত থেকেছে সারাটা জীবন। তার নিরীক্ষার গুরু বিগত শতকের চত্বরের দশকে কলকাতা পর্যন্ত উড়-এন্ডেন্ডিংয়ের মধ্য দিয়ে আর পূর্ণতা পায় লড়নপর্যন্ত কলার এন্ডেন্ডিংয়ের গীতীক রেখার উৎকর্ষ সাধনে - যা তাকে দিয়েছে অনন্যতা।
নিবিয়েচিত্রা, শিল্পকুশলতা আর নেপুৈৈু ভরা সফিউদ্দীনের শিল্পভাব। এ প্রথমে সফিউদ্দীন আহমেদের ছাপচিত্র নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সফিউদ্দীন আহমেদ - শিল্পচিত্র যার কাছে ছিল নিমিত্ত সাধারণ বিষয়। ফলে তার প্রতিটি শিল্পকর্মে লক্ষ করা যায় দক্ষতা, অতিশীতোষ্ণতা, একঘাত্মা বা অভিনবতার ছোঁয়া। ছাপচিত্রের প্রায় সকল মাধ্যমে তিনি ছিলেন সিদ্ধান্ত। সর্বদা নিরীক্ষণশ্রবণ এ শিল্পীর ব্যক্তিগত ও শিল্পকর্ম যেন অভিসন্ধি সত্য। তার চিত্রের জন্মের সর্বদা প্রণয়িতর পরশু অনুভূত করা যায়।
নিরীক্ষা ও নদনের সমিলনে শিল্পী সৃষ্টি করেছেন অনবদ্য শিল্পকর্মসমূহ।

সফিউদ্দীন আহমেদের শিল্পযাত্রা
কলকাতার সরকারী আর কলেজের শিল্পশিক্ষা থেকে লড়রে সেট্রাল স্কুল অফ আর্টস অ্যান্ড ক্র্যাফটস পর্য্যন্ত দীর্ঘ পরিসর সফিউদ্দীন আহমেদের একাদশিক শিক্ষা গ্রহণের কালপর্যন্ত। এ সময়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রাতিনিধিত্ব ছাড়িয়ে গেছেন নিজেকে। অধুনালীক শিল্পের নানা মাধ্যম আত্মো করেছেন নিবিড় নিষ্ঠা ও একাত্মতায় এবং সারাটা জীবন ব্যাপৃত থেকেছেন শিল্পসাধনায়।

সফিউদ্দীন আহমেদ জনাৱহ করেন ১৯২২ সালের ২৩ জুন কলকাতার ভবনীপুরে। বেড়ে ওঠেন এক শিক্ষিত ও সংকৃতি-নির্ভর পারিবারিক পরিবেশে, ফলে তার মন ও মননে শিল্প-সংকৃতির প্রতি গভীর অনুরাগ তৈরি হয়।
সফিউদ্দীন ১৯৩৬ সালে ভর্তি হন কলকাতা সরকারী আর্টস কলেজ। প্রথমে ড্রাফটস্যাম্যাপে এবং পরবর্তীকালে ফাইন আর্টে। ১৯৩৬-৪২ - এ কালপর্যন্ত সম্পন্ন

* অধ্যাপক, চিত্রকলা, প্রাচ্যকলা ও হাইচিত্র বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

https://doi.org/10.62328/sp.v58i1-2.6
করেন ছয় বছরের শ্রেষ্ঠ সমাম কোর্স এবং এই সময়ে কৃতজ্ঞতা সাধনে সম্পন্ন করেন শিক্ষকতার কোর্স। ১৯৪৬ সালেই নিযুক্ত হন কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুলের শিক্ষকতায়। শিক্ষকতার কোর্সে সফিউদ্দীনের শিক্ষার মাধ্যম ছিল ছাপচিত। (সৈয়দ আজিজুল, ২০১৩: ১৩)

সফিউদ্দীন আহমেদের শিল্পসাগর বিকাশে অবদান রয়েছে বেশ কয়েকজন প্রতিভাধর শিল্পীবাবুদের, যাদের তিনি স্মরণ করেছেন গভীর কৃতজ্ঞতায়, এরা হলেন: মুকুল দে (১৮৯৫-১৯১১), বসন্তকুমার গাঙ্গুলি (১৮৯৩-১৯৬৮), আতুল বসু (১৮৯৮-১৯৭৭), মণীন্দ্রনাথ যুদ্ধ (১৮৯৮-১৯৬৮), রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (১৯০২-১৯৫৫), প্রফুল্ল করমকার, ধর্মেশ্বর মিত্র, আবদুল মজিদ (১৯১০-১৯৩৯) প্রমুখ।' (সৈয়দ আজিজুল, ২০১৩: ১৩)

এসমূহ শিল্পীর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, উৎসাহ-অনুপ্রেরণা করে শিল্পী সফিউদ্দীনকে শিল্পীর প্রতি আরো বেশি অনুরূপ করে তোলে, বিশেষত ছাপচিতের সম্প্রদায়ের কার্যক্রমেতে আরো হয়ে পড়ে প্রবলভাবে। 'মুকুল দে, রোমেন্দ্রনাথ প্রমুখ শিল্পী ভারতের ছাপচিতকে বিশ শতকের শেষের দিকে যে উন্মত শিল্পীর পর্যায়ে উঠে পেরিওন আরো হয়ে পড়ে প্রবলভাবে। তার শিল্পীর পর্যায়ে উঠে পেরিওন আরো হয়ে পড়ে প্রবলভাবে। তার সমস্ত ভারতের অধিক ছাপচিতের অগ্রণী শিল্পীদের তালিকায় তার নাম অনিবার্যতা যে বক্স হয়ে পড়ে।' (সৈয়দ আজিজুল, ২০১৩: ১৪)

ছাত্র জীবনেই অখন্ড বাংলার বাংলাকৃতী ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে সফিউদ্দীনের নিবৃত্ত সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ১৯৪৪ সালের ডিসেম্বরে সর্বভারতীয় ছাত্র ফেডারেশনের উদ্বোধনে 'বেঙ্গল পেইন্টার্স টেস্টিংমন' শীর্ষক ছবির অ্যালবাম প্রকাশিত হয়। এ প্রকাশনায় চারজন সম্পাদকের মধ্যে সফিউদ্দীন আহমেদ ছিল অন্যতম। 'তাঁর শিল্পলোক গড়ে এসব সম্পাদকের রয়েছে এক তাত্পর্যপূর্ণ ভূমিকা।' (সৈয়দ আজিজুল, ২০১৩: ১৫)

চলিত্রের দশকে শিল্পী সফিউদ্দীন সর্বভারতীয় পর্যায়ে একজন প্রতিভাধার শিল্পী হিসেবে পরিচিত হয় ওঠে। তাঁর অনন্য শিল্প প্রতিভার বীর্যক্ষমতা বেশ কয়েকটি পুরস্কার লাভ করেন; এর মধ্যে ১৯৪৫-৪৭ পর্যন্ত চারটি পুরস্কার লাভ করেন। এ পুরস্কারগুলো হলো: কলকাতার আর্কেটেকার্ক অফ ফেইন আর্ট প্রেসিডেন্ট স্বর্ণপদক' (১৯৪৫), নয়দিনিতে দা আল ইহিয়া ফাইন আর্টস আন্ড ক্রাফটস সোসাইটির উদ্বোধনে আয়োজিত আন্তর্জাতিক সম্মেলন চারকলা প্রদর্শনীতে প্রথম পুরস্কার (১৯৪৬), ওই একই প্রতিষ্ঠান আয়োজিত ঐতিহ্যের চারকলা প্রদর্শনীতে প্রথম পুরস্কার (১৯৪৭) এবং পাতিনা শিল্পকলার পরিষদ প্রদত্ত 'দ্বারবাহ মহারাজার স্বর্ণপদক' (১৯৪৭)। পরিপূর্ণ দুইবার পুরস্কার প্রাপ্ত বীর্যক্ষমতা শিল্পী সফিউদ্দীনকে 'দ্বী আল ইহিয়া ফাইন আর্টস আন্ড ক্রাফটস সোসাইটির' সদস্যপদ দিয়ে সমাপিত করা হয়। (সৈয়দ আজিজুল, ২০১৩: ১৫; আল্পতী, ২০১২: ১৯)।
১৯৪৩-৪৪ কালের বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক শিল্প প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন শিল্পী, ১৯৪৬-এ প্যারিসের মর্ডান আর্ট মিউজিয়ামে ইউনেস্কো আয়োজিত প্রদর্শনীতে ভারতের প্রথিতযশা শিল্পীদের সাথে তার ছবিও নির্বাচিত হয়। বিশেষ অর্থ শিল্পীর অংশগ্রহণ করেন এ প্রদর্শনীতে। পিকাসো, ব্রাক, মার্টিস, শ্যামালের মতো শিল্পীদের সাথে তারও ৩টি শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হয়। এ শুধু ব্যক্তি সফিউদ্দীনের নয়, যা ছিল ভারতীয় উপমহাদেশের শিল্পকলার জন্য এক বিষাল সমান। (মাহমুদ, ২০০২: ৩৫) এসমস্ত সমান শিল্পী সফিউদ্দীন আহমদকে সর্বভারতীয় পর্যায়ে মর্যাদা দান করে।

১৯৪৭ সালে ভারতভাবের পূর্বই সফিউদ্দীন আহমদ প্রতিভাধর শিল্পী হিসেবে পরিচিতি পেয়ে যান কিন্তু ভারত-বিভক্তির ফলে কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুলের সকল মুসলিম শিক্ষক পূর্ববাহিনী চলে আসেন। ফলে ঢাকায় এসে সফিউদ্দীন আহমদকে সম্পূর্ণ নতুন পরিস্থিতির সমুথি হচ্ছে হয়। (শেখন, ২০০৭: ৩০২)।

ঢাকায় চার্কলা শিক্ষার প্রতিষ্ঠান গড়তে জয়নূলের সহযোগী হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন সফিউদ্দীন। ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষক হিসেবে শিক্ষকতার জীবন শুরু করলেও ১৯৪৮ সালে ঢাকা সরকারি চার্কলা ইনস্টিটিউট শাহাতিয়ার প্রধান পদে নিযুক্ত হন। শুধু আর্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠায় নয় এদেশে অসামান্য সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন সর্বদা। 'ঢাকা আর্ট গ্রুপ' প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সমাজ জীবনে চার্কলার গুরুত্ব প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হন। (সৈয়দ আজিজুল, ২০১৩: ১৯)

শিল্পী সফিউদ্দীন আহমদ ছাপচিত্রে উচ্চ শিক্ষায় ১৯৫৬ সালে লড়ত গমন করেন। সৈয়দ আজিজুল মনুন প্রাতিষ্ঠানিক কর্তৃপক্ষের কার্যকলাপের মাধ্যমে এই শিল্পী নিয়োজিত হন। চার্কলা ইনস্টিটিউটের কর্তিন টেকনিকল-নির্দেশিত শিল্পমাধ্যমে হোটেলের বন্ধু। 'একটি অন্বেষণ এন্টোগ্রাফিংয়ের কর্তিন টেকনিকল-নির্দেশিত শিল্পমাধ্যমে হোটেলের নিয়ে এসেছিলেন অন্তর্বৃক্ষ ছম্বোয় রেশার বিন্যাস এর ইতিপূর্বে সম্পর্কস্বরূপ বলে বিবেচনা করা হয়নি। টেকনিকল বা শিল্পীর কুয়ালতা ও পরিশীলনের প্রতি আগ্রহ আগ্রহী সফিউদ্দীনকে ছাপাইছিল রেডের এ বেগবান সম্প্রকাশযোগ্য তীর্থে ভাষায় আকর্ষণ করেছিল।' (আজিজুল মনুন, ২০১৬: ৪২২) লড়তের শিল্পশিক্ষা, শিল্পক শিল্পমালার তৈরি ও প্রশাসন এবং এ সময়ে ইয়োগোপের নানা শিল্পালার পরিদর্শনের সূচনা সৃষ্টি হয়, ফলে সফিউদ্দীনের মনে নতুন শিল্পবোধের সংঘারণ লক্ষ করা যায়। (সৈয়দ আজিজুল, ২০১২: ৯০)।
লতানের শিল্পশিক্ষা সম্পন্ন করে শিল্পী দেশে ফিরে আসেন ১৯৫৯ সালে। (রফিকুল, ২০১২: ৫৭) সঙ্গে নিয়ে আসেন নানা অভিজ্ঞতা সমূহ শিল্পকুশলতা আর নৈপুণ্যের সাথে শিল্পীত্ব। দেশে ফিরে হাঁটাচরহ নানা-পরীক্ষার ব্যাপৃত হন, রূপান্তর যন্ত তার চিত্রের ভাবায়। এ পর্যায়ে ১৯৬৩ সালে চারকুলালয় অধ্যাপনের জন্য তিনি পাকিস্তান সরকার প্রদত্ত ‘প্রেসিডেন্ট পদক’ লাভ করেন। (সৈয়দ আজিজুল, ২০১৩: ১৯)।

১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় শিল্পী ঢাকায় তার সাহিত্যিক বার্তাতে ছিলেন এক প্রকার অবস্থাতে অবস্থায়, প্রত্যক্ষ করেন বিশেষ্যিকায় পরিচিতি, যার প্রভাব পড়েত তার বিশেষতা। ১৯৭১-পরবর্তী সময়ে মাওলানিবেশ করেন এবং অতুল্য বিভিন্ন পরিকল্পনা তার মধ্যে আবর্তিত থাকে তার বার্তাকে অবিরুচিত শিল্পীর চিত্রশিল্প তথ্য মাধ্যমে শিল্পীকে পৌঁছে দেন অনন্ত মাত্রায়।

শিল্পভাবনা

সফিউদ্দীন আহমেদ - আপাদনন্দক এক শিল্পীর শিল্পীর নাম। তাঁর চিত্র করণোপায়ের সিদ্ধান্ত নিপৃণতা, আজ্ঞানির্দিষ্ট নির্দেশ ধারাত্রিয়ানির্দিষ্ট, দৃষ্টিভাববিশেষ প্রাণগ্রহণের এবং পরিচিতি, সংগঠনের মনে আবেগের অনুভূতি এর নান্দনিকের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। প্রতিনিধিত্ব এক অনুমোদন চাড়া করে ফিরেছে শিল্পীকে জীবনভাব। ফলে তার শিল্পস্থান বৈচিত্র্যের, রূপান্তরের এক অপার ভাবার।

সফিউদ্দীন আহমেদ প্রায়ই বলেন ‘আমার সবচেয়ে ভালো ছবি আমি এখনো আঁকতে পারিনি’ (সৈয়দ আজিজুল, ২০১৩: ১১)। তাঁর এ অতৃপ্তি প্রসঙ্গে সৈয়দ আজিজুল হক (২০১২: ৮৮) বলেন:

এই অতৃপ্তি একজন মহৎ শিল্পীর সহজতাতে বৈশিষ্ট্য। এ কারণেই ছবি একে তাঁর কখনো মনে হয় যে, তিনি ভালো কিছু একে ফেলেছেন। একরাম অপূর্বতা নিয়েই সাথেই কাজ করার ফলে এক জায়গা তাঁর আটকে থাকেনি। পরিণামে মনোকথা, হাপচিত্র, চেলচিত্র – এই তিন মাধ্যমেই তিনি অর্জন করেছেন এক শিখরমাঝা কৃতীতে। রাজ্যের মত ভাবান্তর তাঁর শিল্পগুলি সর্বাধিক সামাজিক ও সমৃদ্ধ করেছে। আর্থিক উন্নতির চেয়ে তিনি সব সময়ই চেয়েছেন আজ্ঞার উন্নতির সাথে সম্পর্কি সহঃস্বাভাবিক ও উন্নতির সাথে। সেজন্য সাথের যুগের পরিবর্ধনের দ্বারাকে নিজ চিত্রের অধ্যয়নকারি করারও চেষ্টা করেছেন। সব সময়ই চেষ্টা করেছেন চিত্রের জমিয়ে নতুন কিছু যোগ করার। মূল পরিশ্রম-নিরীক্ষার মধ্য দিয়েই আয়ত করতে চেয়েছেন যুগের পরিবর্ধনশীলতার দিক। মান্যতায়, কোমল সত্যের অধিকারী এই শিল্পীর মনে সর্বরাত্রই ছিল এক প্রতিশ্রুতির ভাব, যা তাঁর চিত্রের জমিয়েকে দিয়েছে অসামান্য প্রাঙ্গনের ব্যক্তা।
শিল্পী সফিউদ্দীনের চিত্রের বিবৃতি সম্পর্কে তিনি আরো বলেন: ‘An especially noticeable aspect of Safiuddin Ahmed’s work is the variety of themes, grounded in what his country has offered him. On this basis, his canvas has always depicted social realism and his yearning to touch the very soul of the land has been pronounced.’ (Syed Azizul, 2011: 31).

১৯৪৭ সালের দেশভাব তৎকালীন পূর্ববঙ্গে এসে নতুন আবাস গড়া, সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশ, নতুন অভিজ্ঞতায় পুঃ হয় তার জীবন। ফলে চিত্রের ভাষাতেও পরিবর্তন আসে। নদীমেখলা পূর্ববঙ্গা তথা বাংলাদেশের জীবন-জীবিকা আর মানুষের অন্তর্ভুক্ত সৃষ্টির অনুপ্রপ অনুভব করা যায় তাঁর চিত্রে, নদী-নৌকা, জাল-জেল, মাছ, বন্যায় প্রায়বর্ত বাঙ্গালার রূপ। সর্বাপর বাঙ্গালার প্রকৃতি ও শ্রমজীবি মানুষের কর্মকলালঘোর মুখর তাঁর চিত্রের জীবন।

১৯৫৬ সালে লন্ডন যাওয়ায় পূর্ববঙ্গের সফিউদ্দীনের চিত্রকলা ছিল মূলত অবস্থানবিহীন, চন্দ্র-জাত্রা প্রকৃতি-পরিবেশের উপর ভিত্তি লক্ষ করা যায়। কিন্তু লন্ডন যাওয়ার পর তাঁর চিত্রে ভাঙ্গা-গড়া খেলা চলতে থাকে, ফলে পরিচিত জোয় যেন পুরোপুরি হারিয়ে যায় এবং তাঁর চিত্রকলা ভিড় করে নানা অপরিচিত অবস্থান অর্থাৎ এ সময় তাঁর চিত্রের ভাষা হয়ে ১ঠে ইমেজ প্রধান; অনেক বেশি করণকৃতিষ্ঠনিতর। চিত্রের আঘাত নির্মাণে নানা-পরিক্ষয়ে ব্যাপৃত থাকেন তিনি। এ প্রসঙ্গে শিল্পী বলেন:

আমার মধ্যে সবসময় যে অত্যন্ত কাজ করে তা সুন্দর ভাবে। আবার একই সঙ্গে তা উন্নত একটা টেকনিকের জন্য। টেকনিকাল সাইডটাকে নিয়ূত করার দিকেই আমার বোঝাতে। টেকনিককে সৃজনশীলতায় প্রয়োগ করা দিয়ে আসল কথা। (সৈয়দ আজিজুল, ২০১৩: ২৫)

সফিউদ্দীনের কাজ পরিক্ষা-নিরীক্ষায় ঠাসা, টেকনিক বা করণকৃতিষ্ঠনের প্রয়োগ থাকলেও তা টেকনিকাল সর্ব্বর যা। তাঁর চিত্রের ভাষা অনেক বেশি সংরক্ষিত ও সৃজনশীলতায় সমৃদ্ধ।
সফিউদ্দীন আহমদ ওহু ছাপচিত্রের মার্গ, রেখাচিত্র আর তেলচিত্রও সমানভাবে পারদর্শী ছিলেন। তিনি এক মাধ্যমের নানা বৈশিষ্ট্যকে অন্য মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করতেন। যেমন ছাপচিত্রের নানা মাধ্যমগত বৈশিষ্ট্য তেলচিত্রে সংপ্রীতি করার চেষ্টা করেছেন। তেমনি তেলচিত্রের বুনচিত্রের বৈশিষ্ট্যকে ছাপচিত্র-তে প্রোলোগ করে এ মাধ্যমে বৈচিত্র্য এনেছেন। আবার একটি ছবিতে কাজ করতে গিয়ে নতুন কোনো ইফটে বা রূপের সমান পেলে তিনি অন্য ছবিতেও প্রোলোগ করতেন। এ প্রসঙ্গে শিল্পী বলেন:

এক ছবি থেকে কিছু আবিষ্কার করলে পরবর্তী ছবিতে তার ব্যবহার করা এবং তার ফলাফল দেখে আবার কিছু পেলে পুনরায় আরেকটিতে তার ব্যবহার করা, এভাবে দেখতে দেখতে মুখের চিত্রকর চলাচলে আসন্ন। নতুন কিছু পাওয়ার আশায় যে এগিয়ে যাওয়া, সেটি তা আসলে শিল্পীদের অনুপ্রেরণ। এটিই আসল। শিল্পকলার ক্ষেত্রে শিল্পীর এ কথাটি হয়তো অতিরিক্ত সত্য। নতুন কিছু সৃষ্টি আর পাওয়ার আশার মধ্যে মরীচিকার মতো আকর্ষণ করে বলে তাঁদের একের পর এক ক্যানভাস সাজিয়ে তোলেন। (রফিকুন, ২০১৬: ৮৮)

এভাবে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় শিল্পী সফিউদ্দীন মুখে পেয়েছেন নিজস্ব এক শিল্পভাষা, যা তাকে দিয়েছে বিশিষ্টতা।

সফিউদ্দীন আহমদের উল্লেখযোগ্য ছাপচিত্র

শিল্পী সফিউদ্দীন আহমেদ চিত্র রচনা করেছেন নানা মাধ্যমে - তেলচিত্র, জলারঃ চিত্র, রেখাচিত্র ও ছাপচিত্র সকল মাধ্যমেই তাঁর সমান দক্ষতা। তবে ছাপচিত্রের ছায়া হওয়ায় ছাপচিত্রের নানা মাধ্যম নিয়ে নির্বাচন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যাপৃত থেকেছেন জীবনভূত। উড-এনএলেভিং, ড্রাইপের্ট, লিথোগ্রাফি, এচিং, অ্যাকুলাটিং, মেটাল-এনএলেভিং প্রভৃতি মাধ্যমের ছাপচিত্রসমূহ তাঁর চিত্রকলার জগতে করেছে সমৃদ্ধ।

সফিউদ্দীন আহমেদের ছাপচিত্র রচনার শূরুর হুই উড-এনএলেভিংয়ের সৃষ্টিরুহার কার্যকাজ দিয়ে সেই চিত্রের দশকে কলকাতার পর্যন্ত। উড-এনএলেভিংয়ের করণকৌশলগত দিকই ছিল তাঁর বেশি আগ্রহ, ফলে এ মাধ্যমে তিনি অসাধারণ কিছু ছাপচিত্র নির্মাণ করেন।

উড-এনএলেভিং চিত্র

উড-এনএলেভিং মূলত রিলিফ পদ্ধতির একটি মাধ্যম। এ মাধ্যমটিতে সাধারণত ক্রস সেকশনে কাটা নর্ম কাঠের সমতল অংশ নর্ম, বুরিন ইত্যাদি নানা খোদাইয়ের সাহায্যে খোদাইয়ের মাধ্যমে উচু রূপ তৈরি করে ছাপ নেওয়ার পদ্ধতি। (শেফদান, ২০১৬: ৪২; Basupurna, ২০১১: ৬) এ পদ্ধতিতে কাঠের রূপের চিত্রে অস্তু সৃষ্টিতরুঙ্গ রেখার সাহায্যে আলো-অভাবী মায়াজালে দৃষ্টিনন্দন ছাপচিত্র নির্মাণ করা যায়। সফিউদ্দীন আহমেদের উড-
এনএফএনর সূচনাপর্বে রচিত ছাপচিত্রকলার নিদর্শন হলো ‘বিহারের দুষ্য’ (১৯৪০), তবে এ চিত্রকলাতে সফিউদ্দীনের শিক্ষানির্দেশকার বিষয়টি স্পষ্ট। পরবর্তীকালে আঁকেন বাঁকুড়ার দৃশ্যা’ (১৯৪২), ‘সাতাল রমণী ও শিখ’ (১৯৪২), ‘কৃষকের মুখ’ (১৯৪২)।

কৃষকের মুখ

উল্লিখিত বিন্যাসের এ চিত্রটি যে কৃষকের জীবন-সংগ্রামের চালিতু, চিত্রটির কেন্দ্রভাগে উপস্থাপন করা হয়েছে কৃষকের আবক্ষ অবয়ব। চিত্রের পন্থাত্ত্বিকতায় রয়েছে কৃষকের নিত্যদিনের কর্মকাণ্ড বা ফসল ফলানো থেকে ফসল সংগ্রহের যে ধারাবাহিক প্রক্রিয়া তার সুস্পষ্ট বর্ণনা বিবৃত্ত হয়েছে। চিত্রের ডান দিকের থেকে শুরু হয়েছে এর ধারাবাহিকতা - যথাক্রমে রয়েছে কৃষকের হালচালের দৃশ্য, তারপর ফসল বেঁধা, ফসল কটা, গরুর গাড়ি বোঝাই পকা ফসল নিয়ে বাড়ি ফেরা, ফসল মাজাই, নানা আরামের লুটিহাত বিন্যাস। বর্ষার বাংলার প্রকৃতিকেও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এখানে। রোদে পুঁড়া, বৃষ্টিতে ভিজে, শ্রম-যামে সিক হয়েই একজন কৃষকের দৈনন্দিন পথ চলা - তা এ ছাপচিত্রের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে দেখা দিয়েছে। এ চিত্রে কৃষকের পুরো কপাল জুড়ে দুর্লভচার বলিকা; চোখে-মুখে হতাশার ছোঁয়া। চিত্রের এ কৃষক একজন বর্গচারিত হতে পারে - যে চাষিদের জীবনযাপন নিদর্শন করে, সারা বছর হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে উৎপন্ন ফসলের পুরোটাই চলে যায় জমিদার-জোহরদারদের ঘরে; ফলে প্রায় সামান্য ফসলে কৃষকের সংসার চলাচলের দ্বারে, কৃষকের এ মুখাবার আমাদের চলতিরের দশকের ‘তে-ভাগা’ আন্দোলনের কথা মনে করিয়ে দেয়। কৃষকের মুখে একজন দাড়ি আর গলায় বোঝানো তাবিজ থেকে বাংলার লোকধর্ম বা লৌকিক ইসলামের বিষয়টিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

চিত্রটির মূল বৈশিষ্ট্য এর লাইন বা রেখার ব্যবহার। কুটলের ঐঠাড়ে নানা রকম রেখার বিষয় চিত্রের জুড়ে, সাথে রয়েছে আলো-ছায়ার যথাযথ উপস্থাপন। পুরোপুরি বর্ণনামূলক এ চিত্রে কৃষকের মুখছবি যেন বাংলার কৃষকের জীবন সংগ্রামের প্রতিষ্ঠাবি।

ঘরে ফেরা বা বাড়ির পথে

উড-এনএফএনজ্যাম মাধ্যমে সফিউদ্দীনের প্রথম উল্লেখযোগ্য চিত্র হলো - ‘ঘরে ফেরা’ বা ‘বাড়ির পথে’ (১৯৪৪)।

এ চিত্রে গোলোল্লের আকাশ; আকাশের অপার সৌন্দর্য, সারি সারি তালগাছের অপরূপ শোভা, বিকৃত মাঠের ওপর আলো-আঘাতী খেলা, রঙাঙাদের মেঝের বেঁধে চলা মহিষের দল- সবকিছু মিলে এক মুনোমুনোক্রান্ত রূপের অবতারণা করেছেন শিক্ষা এ ছাপচিত্রের মাধ্যমে দিয়ে।
এ চিত্রের পশ্চাদ্ভুতের পুরোটাতুল্য রয়েছে সম্ভবত আকাশ। বুরাইনের আঁচড়ে নানা রেখার ব্যবহার করেননে শিল্পী। এ রেখা কখনো মোটা, কখনো সরু, কখনো সরল, কখনো বৈধিক; অর্থাৎ গতিশীল রেখার বহুজীবিক উপস্থাপন লক্ষ করা যায়। কাঠের শত বুক চিত্রে আকাশের প্রতিরূপ সৃষ্টিতে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন শিল্পী। গোধুলি বেলার কীণ আলোর পরশ ছড়িয়ে রয়েছে সম্পূর্ণ চিত্রটি জড়ে। সুচিত তলগাছের সারির ধারে বেঁধে বাড়ি ফিরবে মহিষের দল, দলের শেষে পাতার ছাতা মাথায় দিয়ে রাখাল—সবকিছু ঘনকালো হয়ে উঠেছে। মাঠের ওপর পড়েছে কীণ আলো; যা অতি সুন্দরতরূপে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এ চিত্রটিতে উড-এনগোড়া মাধ্যমে বৈশিষ্ট্যহীন এর কমপ্লেক্সশন, রেখার মূল ব্যবহার ও আলো-আঁধারী খেলায় শিল্পীর দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়।

সাধারণ রমণী

উড-এনগোড়া মাধ্যমে শিল্পী সফিউদ্দীন আহমদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য শিল্পকর্ম হলো ‘সাদাতল রমণী’ (১৯৪৬)।

এ চিত্রটি মূলত দুইজন সাদাতল রমণীর জলাশয় থেকে জল সংগ্রহের দৃশ্যাঙ্ক। ঘনবৃক্ষসরীরকে মাঝে জলাশয় থেকে দুই রমণীর কলসে জল-ভরায় বিশেষ মুহূর্তক মূর্তি করে তোলা হয়েছে। এ চিত্রে। রমণীদের একজন জল ভরতে মায়া, আরেকজন দোপানে চেয়ে রয়েছে চকিত নয়নে।

এ চিত্রের মূল আকার্ষণ হলো এর কমপ্লেক্সশন বা বিন্যাসরীতি এবং আলো-ছায়ার পরিবর্তন ব্যবহার। আলো-ছায়ার পরিবর্তনে দুই রমণীকে চিত্রাঙ্কিতভাবে রূপ দেয়া হয়েছে - পরের শাড়ির ভাঁজা, গলায় ধাতব বা পৃষ্ঠের মালা, হাতে বালা, বাজুরাট, কানে দুল, কোনায় পোঁজা ফুল, এসবের মাঝে সাদাতল রমণীদের শারীরিক ও মানসিক সৌন্দর্যের ছাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ চিত্রে আলো থেকে পড়ছে রমণীদের দেহমালবে, শাড়ির ভাঁজা আর জলের রূপে। আলো পড়ছে গলায় গুলির; পল্লবগোলাপী শাখার-শাখা। প্রকৃতপক্ষে আলো-ছায়ার যথাযথ ব্যবহারেই এ চিত্রটি আরে বেশি প্রাপন্ত হয়ে চলেছে। চিত্রের পশ্চাদ্ভূতের উজ্জল-নারীকে উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে পরিশ্রমকের বিষয়টিতে স্পষ্টভাবে ঘরা দিয়েছে। মোটা ও সরু বুরাইনের দফ ব্যবহারে ছাপচিত্রটি পেয়েছে অনন্য মায়া। 'সাদাতল রমণী' শৈল্পিক এ চিত্রটি সম্পর্কের চিত্র সমালোচক হেমকোষ ব্যার্টসন 'দৈনিক স্টেটসম্যান' পত্রিকায় লেখেন, 'সফিউদ্দিনের 'সাদাতল রমণী' কেবল একটি রসপূর্ণ চিত্রই নয়, ইহা তাঁহার মহৎ শিল্পসম্পদের একটি রূপবান নির্দেশ'। (মাহমুদ, ২০০২: ৬০)
এ চিত্রের রমণীদ্বয়ের জলভাগ দৃশ্য ও সাঁতাল সম্প্রদায়ের নয় বরং বাংলার সমগ্র নিবন্ধগীয় জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার প্রতিচিত্র।

মেলার পথে

উড়-এনগ্যাডিং মাধ্যমের আরেকটি উল্লেখযোগ্য চিত্র হলো ‘মেলার পথে’ (১৯৪৭)। আনুভূতিক বিন্যাসের এই চিত্রটি বাংলার গ্রামীণ জনপদের বৈচিত্র্যময় জীবনযাত্রার দৃশ্যমূলক।

এ চিত্রের মূল বিষয় হলো, গ্রামের আইকা-বীরা মেলাপথে চলে চলেল মানুষ, যারা চলেছে মেলার পানে। বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে ‘মেলা’ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান।

মেলার একটি সাধারণ কিছু প্রধান কাজ হলো নানা মন, মত ও ভাবার মানুষকে মেলায়। এই মিলন একদিকে মানুষের পারস্পরিক মিথ্যাকল্পনা সম্পন্ন করে, হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের সংযোগ ঘটিয়া, যাত্রা, চরিত্র, সাক্ষাৎ, পুতুল নেচে মাধ্যমে বিনোদনের চাহিদা পূর্ণ করে, তুষ্টকথা ও তুষ্টির প্রকাশে আত্মিক ক্ষুদ্র নিরুত্তি ঘটায়,... অন্যদিকে একটি কমিউনিটির দেহতাত্ত্বিক সংস্থায় অন্যান্য ঘটনাকে উঁচু ও বিজ্ঞান দার্শনিক বোধ বা বিশ্ববীকৃতি চলাচল রাখে। এই দুই ধরনের কাহারো ছাড়াও গুরুত্বের তৈজসপ্তিনি, সাহিত্যসংসারিক সাহিত্যসংসারিক প্রাণের জিনিসপত্রের সংখ্যা, বিনম্য এবং মুক্তি-স্বর্ণ মেলার অন্যতম কাজ, ... এদেশের মেলা-সংস্কৃতি জীবনসংস্থাত ও আনন্দময়তার এক প্রবল সংস্কৃতিতে ব্যাপ্ত। (শামসুজ্জামান, ২০১৩: ৬৭)

মেলার তাত্ত্বিক, আত্মিক ও উপযোগিতামূলক দিক রয়েছে বললেই এক জায়গায় সমিলন ঘটে বহুমানুষের। এ চিত্রের মানুষগুলো যেন সে লক্ষ্যে হুটেছে মেলার পথে।

এ চিত্রের অভ্যাসে রয়েছে দুটি বুক; বুক দুটির মাঝে দুই বৃহদিরোচী হয় সজ্জিত। মেলার পথে চলেছে এক ব্যবসায়ী; মাথার ওপর ধরে রেখেছে বিশেষ ধরনের পাতার হাতা এবং মেলার পথে নানারকম ব্যবসায়িক সামাজিক। মেলায় যে নানা সম্প্রদায়ের নানা শ্রেণী-পেশার মানুষের সমাগম ঘটে এ চিত্রে সে বিষয়টি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। হাতা মাথায় এক রমণী, যার সাথে হেটে চলেছে এক নয় শিশু। মেলার পথে হুটেছে এক কুকুর। কুকুরের চলার ভঙ্গি দৃষ্টি আকর্ষণ করে; অনেক বেশি বাংলাদেশভাবে ধরা দিচ্ছে। দূরের রাস্তায় চলেছে গরুর গাড়ি; কাছে দূরের দোলাচল পরিপ্রেক্ষিতের বিষয়টিও স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন শিল্পী। সমগ্র চিত্রোচ্ছে একধরনের গতিময়তা লক্ষ্য করা যায়, যে শিল্পী অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ফুটিয়ে তুলেছেন।
ছায়াময় দুই বৃক্ষ ফাঁক দিয়ে কোমল আলোকের উভাসিত চিত্রের কেন্দ্রভুমি, আলো পড়েছে ঘোড়ার পিঠে, ঘোড়সওয়ারের ছায়ার কিনারা জুড়ে, গাছের গুড়িতে, পদমজ্জরির বুক জুড়ে। ঘোড়সওয়ারের তালি লাগানো জামা, মায়ের সাথে নয়াশিশ শিশুর পায়ে পায়ে পথ চলা - যেন এক নিম্নোর্গায় মানবসমাজের প্রতিনিধিত্ব করছে মেলার এ যাত্রীসকল।

বুরিনের যথাযথ ব্যবহার শিল্পীর দক্ষতার বিষয়টি সেখান স্পষ্ট, তেমনি বুরিনের নানা রকম কারিকুরি আর বুনোটি চিত্রটিকে দেখেছে ভিন্ন মাত্রা। এ চিত্রের মূল আকর্ষণ হলো চিত্রের আলো-অাহারীর খেলা, পরিমিত আলোকসমাপ্তার ফলে চিত্র হয়ে উঠেছে অনেক বেশি মনোমুগ্ধকর।

গুন্টানা

শিল্পী সফিউদ্দীনের সমবিমূর্ত ধাঁচের উড-এনগ্রস্টিং চিত্র হলো ‘গুন্টানা’ (১৯৫৫)।

আনুষ্ঠানিক বিবর্ধার এ চিত্রটিতে গুন্টানা অবস্থায় দুইজন মায়েরকে উপস্থাপন করা হয়েছে স্টাইলাইজডভাবে। এখানে নৌকা বা নৌকার পাল দৃশ্যমান না হলেও যেন প্রাতীকিত্বের উপস্থিতি, নলদীহর ধরে ছুটে যাওয়া দুই মাত্রা সকল বাণী-বিপরিতে মাল্যাড়ের দীপঃপায়ে সমুখপানে ধাবমান।

চিত্রের ঢেউখেলানো গীতিব রেখাগুলো যেন প্রবহমান নদীর জলের প্রতিনিধিত্ব করে। উড়ন্ত পাখির উপস্থিতি, নিরস্ত্র প্রবহমান জলধারা - যেন একধরনের গতিময়তাকে ইঙ্গিত করে। গতিময়তা এ চিত্রের মূল বৈশিষ্ট্য।

জ্যামিতিক ফর্ম আর রেখায় কিছুটা আলংকারিক বা নকশাধরী ধাঁচ পেয়েছে চিত্রটি। চিত্রে মানবদেহহাওয়ে আলো ঠিককরে পড়েছে, যা আরোপিত হয়েছে ছবির মূল বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়ার প্রয়োজন। শিল্পীর কারিগরিকৃততা বা বুরিন চলাচলের মুখ্যিন্তায় অসাধারণ। মোটা-সরু বুরিনের নানাভাবে খোদাইমার ফলে রেখা আর বুনোটে এসেছে বৈচিত্রময়তা।

সকল প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে নিরস্ত্র ছুটে চলাই যে সংগঠনীয় জীবনের মূল কথা - এ চিত্রে শিল্পী সেই বিষয়টি ফুটিয়ে তুলেছেন অত্যন্ত সার্থকভাবে।

বন্যা

উড-এনগ্রাফিং মাধ্যমে সফিউদ্দীনের সর্বশেষ চিত্র হলো ‘বন্যা’ (১৯৫৬)।

১৯৫৪-৫৫ সালের দুর্বিষহ বন্যার ভয়াবহ অভিজ্ঞতায় আঁকা এ চিত্র। এ চিত্রটিতে আঁকা হয়েছে মূলত ঢাকার বামীবাসের বন্যার দৃশ্য। কারণ শিল্পী এ সময় বামীবাগে
বসবাস করতেন। অন্নদামোচ্ছিন্ন বিন্যাসের এ চিত্রটিতে বন্যাপ্রাপ্ত জনজীবনকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

এ চিত্রে দেখা যায়, বন্যার তোঙ্গঘ দুবে গেছে সমগ্র লোকালয়, মাথাচোখা দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে হুমকির বা খেড়ের দোচালা ঘরবাড়ি, খেড়ের গাদা। এ সময় মানুষের চালচলনের একমাত্র বাহন নৌকা, নৌকা করে মানুষ খাবারসহ নিত্যঋতুজনীয় দ্রব্যসামগ্রী বহন করে চলেছে - যা খুবই অত্যন্ত। একান্ত এক রুক্ষের পাশ দিয়ে দুজন মানুষ কোমরস্মীন পানি ভিড়িয়ে হেঁটে চলেছেন; যাদের একজনের মাথায় খোঁড়া এবং অন্যজনের মাথায় ডালা; তারা হয়তো খুঁজে ফিরছে শুধু আবাস বা নিরাপদ আশ্রয়।

রুক্ষের অপর পাশের বাড়ির বারান্দার মাঠের মাটির দুলাসহ অন্যান্য পাতল লক্ষ করা যায়। অঞ্চলের বিপরীতে আলোর খেলা - উড় এনেপ্রহিল্ড যে মূল বৈশিষ্ট্য তা এ চিত্রে পুরোপুরি বিদ্যমান। ঘরবাড়ি, গাছপালা অঞ্চলের নিমজ্জিত; আলো ঠিকানে পড়েছে বনার জলরাশিতে, আলোর প্রতিফলনে জলের স্বচ্ছতা আর প্রবহমানধারা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠছে।

আলো পড়ছে ঘরের চালায়, গেছে ঘুড়িতে; তবে অতটা একটা নয়। অঞ্চলের আর সব আলোর মাথামাথির চিত্রটিতে ফুটে উঠছে বেদনায়ন পরিবেশ। ব্যাপারের সূচন ব্যবহারে জলের প্রাকৃতিক ফেরারে যে বৈশিষ্ট্য তা বিবিধ হয়েছে সুচারুচর্চা। বন্যাপ্রাপ্ত মানুষের দুর্বিশ্বাস জীবনযাত্রা কাহিনী যেন বিদ্যুৎ হয়েছে এ ছাপচিত্রটির মধ্য দিয়ে অত্যন্ত সার্থকভাবে।

ড্রাইপেরড চিত্র

ড্রাইপেরড - ইন্টাগলিও বা অত্যন্ত ছাপচিত্রের মাধ্যম। ধাতবপাতে এসিড প্রতিরোধী প্রাক্তনের প্রলেপ না দিয়ে নিষ্কাশনের সাহায্যে সরাসরি আঁচড় কেটে এবং এসিডে দ্রুত ফুটে নেওয়ার পদ্ধতি হলো ড্রাইপেরড। (কমল, ২০০৯: ২২৫) এ মাধ্যমে প্রকাশ্কতার পাতায় আঁচড়কৃত রেখার দুই পাশে খাবারটা উঠে হয়ে থাকে; যা প্রেসে অতিরিক্ত কাপালি থাকে রাখা। এ অতিরিক্ত কাপালির ছাপই ড্রাইপেরড মাধ্যমের বিশেষতা। তবে এ মাধ্যমে খুব বেশি ছাপ নেওয়া সম্ভব নয়।

ড্রাইপেরড মাধ্যমের প্রতিটি সফিউদ্দীন আহমেদের আকর্ষণ ছিল। এ মাধ্যমের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন মূলত কলকাতার আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ মুকুল দের ড্রাইপেরড চিত্র দেখে। মুকুল দের ড্রাইপেরড চিত্র সফিউদ্দীনের কাছে যেন কাব্যের আবেদন সৃষ্টি করে। (সৈয়দ আজিজুল, ২০১৩: ৪২) ফলে এ মাধ্যমেও তিনি বেশ কিছু কাজ করেন।
দুমকার শালবন ও মহিষ

ড্রাইপয়েন্ট মাধ্যমে আকা সফিউদ্দীনের প্রথম চিত্রকর্মটি হলো ‘দুমকার শালবন ও মহিষ’ (১৯৪৪)।

উল্লেখ্য বিন্যাসের এ চিত্রটি মূলত দুমকা এলাকার দৃশ্যরূপ। ‘কাট অব এজ’ কম্পোজিশনের এ চিত্রে দেখা যায় মোট পথের দু-পাশ জুড়ে সুনীর্ধ্ব শালগাছের সারি এবং রাস্তা পার হওয়া অবস্থায় মহিষের দল। এত দীর্ঘ শালগাছিলো তুলনায় মহিষগুলো অতি কম। রুদ্রাকার - এর মাধ্যমে শিল্পী যেন প্রকৃতির বিশালতাকেই মেলে ধরেছেন। প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলাই বোধ হয় শিল্পীর মূল উদ্দেশ্য।

শালগাছিলোতে আলো পড়েছে তীর্থংকারে। সুনীত শালগাছের ছায়া পড়েছে রাস্তার বুকে। সামনের ঘাটটি অনেক গাড়ি রঙে চিত্রিত, তবে দুরের গাছগুলো তুলনামূলকভাবে হালকা হয়ে পেছে - যা পরিপ্রেক্ষিতের সুস্পষ্ট ধারণা দেয়।

ড্রাইপয়েন্টের মাধ্যমে কর্মকর্তা বৈশিষ্ট্য এখানে লক্ষ্যীয়। ধাতবপাতে সুচের আঁচড়ে সুষ্ট ওক্তোয় ধারণকৃত রঙের ছোপ ছোপ রঙ এ চিত্রের দিয়েছে ভিন্নমাত্রা। নয়ন অজিজুল হকের মত - ‘চিত্রটির আবেদন অনেকটা কবিতার মত’ (২০১৩: ৪২)।

আলো-ছায়া, পরিপ্রেক্ষিত ও মাধ্যমগত বৈশিষ্ট্যের ধরনে এ চিত্রটি উৎকর্ষ লাভ করেছে।

ময়ূরাঙ্কী তীরে দুই নারী

এ মাধ্যমের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ চিত্র হলো ‘ময়ূরাঙ্কী তীরে দুই নারী’ (১৯৪৫)। এ বিষয়টি নিয়ে শিল্পীর একটি তেলং চিত্রও রয়েছে। আনুভূমিক বিন্যাসের এ চিত্রে দুই সাততাল রমণীকে নদীর তীরের উপরিটি অবস্থায় উপস্থাপন করা হয়েছে। সারা বসে আছে শুন্য কলস নিয়ে; চাহি তাদের নদীর দিকে, দুই হাটুজলে ময়ূরাঙ্কীর কীর্ণ জলধারার মাঝে মাঝায় কলসি নিয়ে দুই নারীকে দেখা যায়; নদীর অপরাঙ্কে পাহাড়ের উপস্থিতি; সবকিছু খুব হালকা রঙে উপস্থাপন করা হয়েছে।

চিত্রের অগ্রভাবের দুই নারীতে সাততালী জীবনধারার বৈশিষ্ট্য একটি। তাদের শরীরের অনেকটাই অন্যান্য, তাদের হাতে বালা, গলায় মালা, কানে দুল, মাথায় গোঁঝা ফুল সবকিছুর মধ্য দিয়ে সাততাল্লী নারীর জীবনের শাষন রূপ মুঁটে উঠেছে। আলো-ছায়া, পরিপ্রেক্ষিত ও সুচারুবিন্যাসে অনবদ্য চিত্রকর্ম এটি।
শাস্তিনিকেতনের দৃশ্যপট

ড্রাইপায়েন্ট মাধ্যমের উল্লেখযোগ্য সর্বশেষ চিত্রকর্ম হলো ‘শাস্তিনিকেতনের দৃশ্যপট’ (১৯৪৫)।

আনুভূমিক বিন্যাসের এ চিত্রটি যেন বীরভূমের চিরচেনা রূপের প্রতিচ্ছবি। এ চিত্রে দেখা যায় বিশৃঙ্খলার বুকে ডাঁড়িয়ে রয়েছে সারি সারি তালগাছ। উচি-নিচি মেঘাপথ ধরে চলছে সাঁওতাল জনগোষ্ঠী; কেউ গরুর গাড়িতে, কেউ-বা পায়ে হেঁটে। চিত্রের অভ্যন্তরের তৃণভূমি, উচি-নিচি মাটির চিত্র, সামনের তাল গাছগুলো অনেক গাছ রঙের এবং ধীরে ধীরে হালকা হয়ে গেছে। অনেক দূরের গাছগুলো খুবই হালকা হয়ে কমায়ে বিলীন হয়েছে বিলীন রেখা - অসাধারণ পরিপ্রেক্ষিতের ব্যবহার।

আলো-ছায়ার ব্যবহারেও শিল্পীর দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। ড্রাইপায়েন্টের বিশেষত্ব এ চিত্রে প্রকটিত হয়েছে।

সাঁওতালী জীবনবাহী পাশাপাশি বীরভূমের অসাধারণ সুদর্শন নিঃসরণশীর অবতরণ করেছেন শিল্পী এ চিত্রের মধ্য দিয়ে। এককথায় দৃষ্টিমুখকর, মনোমুখকর দৃশ্যরূপ এ চিত্রটি।

অ্যাক্যুমাইটিস্ট চিত্র

অ্যাক্যুমাইটিস্টও ইন্টাগলিও বা অসালীন ছাপচিত্রের মাধ্যম। অ্যাক্যুমাইটিস্ট শব্দটিকে দুই অংশে বিভক্ত করে বলা যায় যে, ‘অ্যাক্যু’ অর্থ জল আর ‘মাইটিস্ট’ অর্থ রং-এর আত্মা বা রংপত্র বা ছোপ। জলরঙের মতো টেন্ডাল ইফেক্ট বা বর্ণভার সৃষ্টি করা হয় বলে এ পদ্ধতিকে অ্যাক্যুমাইটিস্ট বলে। (কমল, ২০০৯: ২৩)। জিন্তা বা দৃশ্যর পাতে রজনেন্দ্র ছড়িয়ে ডানা হালকা তাপ দিতে হয় যে রজনেন্দ্র উঠে না যায়। রজনেন্দ্রের বিন্দু বিন্দু ইফেক্টই এ ছবির মূল বৈশিষ্ট্য। আলো-আঘাতী পরিবেশ সৃষ্টিতে কয়েকটি ধাপে সম্পন্ন হয় ছাপ তৈরির প্রক্রিয়া।

সফিউদ্দীন আহমেদ অ্যাক্যুমাইটিস্ট মাধ্যমে যেসব ছাপচিত্র নির্মাণ করেছেন তার মধ্যে ‘ময়ুরাক্ষ’ (১৯৪৫), ‘পারাবত’ (১৯৪৫) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ময়ুরাক্ষ

আনুভূমিক বিন্যাসের এ চিত্রটিতে ময়ুরাক্ষ নদীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। চিত্রে খুব অবস্থায় ময়ুরাক্ষ নদীকে উপস্থাপন করা হয়েছে। নদীর কোথাও কোথাও জেগে উঠেছে চর; ক্ষীণ জলধারা নিয়ে কুলকুল করে এঁকে-বেঁকে ছুটে চলেছে।
ময়ূরাঙ্কী। পানি কোথাও কোথাও সমান, কোথাও পায়ের গোড়ালি অবধি। ফলে খুব সহজেই সাঁতাল সম্প্রদায়ের নর-নারীরা পারাপার হতে পারে। কেউ নদীতে গেলে করছে; কেউ বা জলখার ফিরছে বাড়ির পথে, অ্যাকুয়াটিন্ট মাধ্যমের যে বৈশিষ্ট্য তা এখানে সুপ্রস্তুতরাপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

কয়েকটি বেড়ার মাধ্যমে ময়ূরাঙ্কী নদীর বাসতিবিছে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। জেগে ওঠা নতুন চরের নরম কোমল মাটি বুঝতে কালো রঙের আত্তা এবং জলখার তুলনামূলক হালকা টোনে রূপ দেওয়া হয়েছে। এখানে চরের নরম কাদায় মানুষের পদচিহ্নের বিষয়টিও স্পষ্টভাবে দরা দিয়েছে।

বিকিমিকি আলোর প্রতিফলনে জলের ধারা কোথাও কোথাও খুবই স্মৃতি দেখাচ্ছে। আলো পড়ে নদীর পাড়ের বালু কোথাও কোথাও চিকিৎসক করছে। নদীপাড়ের পাহাড় আর বোধ বোঝাতে রঙের কয়েকটি শীত ব্যবহার হয়েছে। ময়ূরাঙ্কীর রূপমাধ্যম ফুটিয়ে তোলার পাশাপাশি সাঁতালদের দৈনন্দিন জীবনধারার বিষয়টিও প্রতিষ্ঠিত করেছেন শিল্পী। বিয়াস, আলো-ছায়া ও মাধ্যমের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের যথাযথ রূপায়ণে চিত্রটি সাধ্য রূপ পেয়েছে।

পারাবত

এ মাধ্যমের আরেকটি উল্লেখযোগ্য শিল্পকর্ম হলো – ‘পারাবত’ (১৯৪৫)। শিল্পী সফিউদ্দীন কলকাতায় বালিগঞ্জে কয়লার ডিপোতে ক্লাচ করতে যেতেন নিয়মিত। সেখানে এক বঙ্কিতে বাঁশের বুটিতে পরের গাড়ির চাকা বসিয়ে তার ওপর বোধ-ফোড়ো বাল্লা সেসাই কবুতরের বাসা তৈরি করা হয়েছিল, যা শিল্পীকে দায়িত্ব আকৃষ্ট করে। এ দৃশ্যের একটি ক্লাচ করেন: যা পরবর্তীকালে তেলরঙ ও অ্যাকুয়াটিন্ট মাধ্যমে ‘পারাবত’ (১৯৪৫) শীর্ষক চিত্র রচনা করেন।

‘পারাবত’ শীর্ষক অ্যাকুয়াটিন্ট মাধ্যমে আলো চিত্রিতে কবুতরের জীবন প্রতিযোগী ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ছোট ছোট পোষাকে বাস করা, বেঁধে উঠা; উড়াউড়ি সবকিছু মেলে ধরেছেন শিল্পী।

চিত্রের কেন্দ্রীভূতে হাঁট দেওয়া হয়েছে যে কবুতরের খাঁচা, সেখানেই দৃষ্টি নিবন্ধ হয় পুরুষপুরি। বাঁশের বুটিতে, চাকার নিম্নাংশ ঘন কালোতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বোধের ওপর আলো পড়েছে স্তোত্রভাবে। কোথাও আলো; কোথাও ছায়া, আলো-আঘাতীর খেলায় কবুতরের বৈচিত্রে রূপ দেওয়া হয়েছে পুরুষপুরি বান্দ্রাবান্দ্রা ভাবে। চিত্রের পশ্চিমভূত্তমিতেও আলো-আঘাতীর পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে অ্যাকুয়াটিন্ট মাধ্যমের গ্রেইসনে ইফেক্টের দ্বারা। যখনকারো বিপরীতে খুঁতে কবুঁতরগুলোর রূপন স্পষ্টতা লক্ষ করা যায়।
করুণার সংখ্যা নির্বাচিতে যেন শিল্পীর হিসাব মনের পরিচয় পাওয়া যায়। এ হিসাব কম্পাসাসনের ভারসাম্য রক্ষাকর্মী। দুরিকের টানা দড়িও চিত্রের বিন্যাসের ভারসাম্য রক্ষা দারুণভাবে।

এ চিত্রের কম্পাসাসন ও অলো-ছায়ার ব্যবহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অ্যাকুয়ারিয়ামটি মাধ্যমে বর্ণিত হয়। বিদ্যুত্তা তা এ চিত্রে প্রতিপত্তি হয়েছে।

এচিং-অ্যাকুয়ারিয়ামটি
এচিং-অ্যাকুয়ারিয়ামটি হলো অন্তর্জাল ছাপের মিশ্র পদ্ধতি। ধাতবপত্তে প্রথমে এচিং প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হয়। এচিং পদ্ধতিতে জিন্দগী বা দৃষ্টান্ত ধাতব পাত্র ব্যবহৃত হয়।

ধাতব পাত্রটি প্রথমে একটি প্রতিরোধী প্লোটের প্রলেপ লাগাতে হয়। তারপর ধাতব পাত্রে কাজিত চিত্র পরিস্কৃত নিজে দিয়ে অঁচড়া কেটে এসিডে বাইট করিয়ে প্লোট প্রস্তুত করা হয়। (Elizabeth, 1994: 185) এচিং-অ্যাকুয়ারিয়ামটির হিসাব মাধ্যমের ক্ষেত্রে প্রথমে ধাতব পাত্রে এচিংয়ের মাধ্যমে কাজিত রেখা সৃষ্টি সম্পন্ন হলে ধাতব পাত্রে রাজন ছড়িয়ে অ্যাকুয়ারিয়াম প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ছাপের জন্য প্লোট প্রস্তুত করতে হয়।

শিল্পী সফিউদ্দীন এচিং ও অ্যাকুয়ারিয়াম মাধ্যমের সমন্বয়ে বেশিরভাগ শিল্পকর্ম নির্মাণ করেন। যেমন - 'মাছ ধরার সময়' (১৯৫৭), 'নুম যাওয়া বান' (১৯৫৯), 'সেতু পারাপার' (১৯৫৯), 'বিক্ষুদ্র মাছ' (১৯৬৪), 'নীলজল' (১৯৬৫) ইত্যাদি।

মাছ ধরার সময়
অনুভূমিক বিন্যাসের এ চিত্রটি এচিং অ্যাকুয়ারিয়াম ও সফটওয়ারধারা মাধ্যমে আঁকা।
সফিউদ্দীনের এ চিত্রের মধ্যে দিয়েছে ছাপচিত্রের রঙের সমাবেশ ঘটতে। এ চিত্রটি দ্রামবাংলার মাছ ধরার চিত্র প্রচিত রূপ। বিশালকৃতির একটি জালকে বাঁশের সাথে সাথে বেঁধে পানিতে পেতে রাখা হয়। এর নির্দিষ্ট সময় পর তা উঠিয়ে যায় মাছের নৌকায় রাখে যায়। কাজটি সম্পন্ন হয় একজন ব্যক্তির মাধ্যমে।

এ চিত্রটিতে জালকে ব্যাপকভাবে অনেক বড় করে আঁকা হয়েছে, মানুষ আঁকা হয়েছে ছোট করে। 'প্রকৃতির পটভূমিকে মানুষ কত হোট আবার একই সঙ্গে বসতি শুরু মানে এই বোধকে এর মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।' (সৈয়দ আজিজুল, ২০১৩: ৪৮)
চিত্রিতে মানুষ, নৌকা, বাঁশের খুঁটি, জালের কিনার এত্তিমাদাম লাইন ডাইং উপস্থাপন করা হয়েছে। কালো রঙের চোপ, প্রতীকী জলরাশি অ্যাকুয়ারিয়াম মাধ্যম এবং হলুদ রঙের জালের রূপায়ণে সফটওয়াগ মাধ্যম মশারি, মোজার দ্বারা ছাপ দেওয়া হয়েছে। প্রচও গভীরতায় লক্ষ করা যায় এ চিত্রে, যা চিত্রের বিষয়বস্তুর সাথে পরিপূরক বা সামঞ্জস্যপূর্ণ। সাদা-কালো ও হলুদ রঙের মিশেলে এটি এক অনবদ্য শিল্পকর্ম।

নেমে যাওয়া বাণ

‘নেমে যাওয়া বাণ’ (১৯৫৯) শীর্ষক এটি অ্যাকুয়ারিয়াম মাধ্যমে আঁকা আনুভূমিক বিন্যাসের এ চিত্রিতে বন্যা পানি নেমে যাওয়ার পর প্রকৃতি যে রূপ ধারণ করে তা বিবৃত হয়েছে। সমবিস্তৃত রীতির এ চিত্রের পুরোপুরি জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে একটি গাছের রূপকল্প বা ইমেজ। নিন্দ্বাঙে স্থিত পানি ও নৌকা এবং পশ্চাত্তল ঘরের চালার উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। পানিতে নীল, ঘরের চালা আর পাতার রংকে লাল; পল্লির বৃন্দামূলে খাঁচায় এবং কালো মিশেলে রূপ দেওয়া হয়েছে চিত্রটি। নৌকা ও গাছের পাতার অংশপ্রাপ্তি কেঁথাও কেঁথাও অফহোয়াইট রং দ্বারে পুরো চিত্রজুড়ে তারসময় রক্ষা করা হয়েছে চমৎকারভাবে।

এ চিত্রের লক্ষ্য প্যানেলে দুটি রঙের প্রাধান্য, নিচের দিকে নীল কালোর গাঢ় ছায়ায় বন্যার দুর্বিশ জীবন এবং ওপরের দিকের লাল ও অফহোয়াইট রঙে নতুন দিনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, নতুন উদ্দিপনার ইশ্রিত বহন করে। অর্থাৎ বন্যার পানি নেমে যাওয়ার মধ্য দিয়ে দুর্বলের দিন শেষে আশার আলো ফুটিয়ে তোলা হয়েছে রঙের সুচিত্তিত ব্যবহারে। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময়ে আলো-আধারী খেলায় অনবদ্য শিল্পকর্ম এটি।

সেতু পরামার

অ্যাকুয়ারিয়াম মাধ্যমের উল্লেখযোগ্য আরেকটি শিল্পকর্ম হলো ‘সেতু পরামার’ (১৯৫৯)। উল্লেখ বিষয়ের এ চিত্রটি এটির আকার মাধ্যমে আঁকা। এ চিত্রের মাঝা বরাবর দিয়ে একটি সেতু দৃশ্যমান। সেতুর নিচের পানির প্রবাহ, নৌকা, ঘরবাড়ি মানুষ সমবিস্তৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এটি মাধ্যমে নানা রেখার সূচী করা হয়েছে কিন্তু বণিকভাবে যে বৈশিষ্ট্য তা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে অ্যাকুয়ারিয়ামের সূচনা বাণিজ্য ইকোস্টের মধ্যে দিয়ে।

চিত্রের পুরো অংশ জুড়েই গাঢ় রঙের আধিক্য এবং কমাইয়ে সে গাঢ়ত্ব হালকা হয়ে এসেছে, এবং চিত্রের যে অংশটিতে দেখা স্থির হয়ে যায় সে অংশ পুরোপুরি সাদা রাখা হয়েছে। দৃষ্টিকোন রেখায় দ্বারা গভীরতা রূপ প্রতিকৃত হয় এ চিত্রে। এ চিত্রের কম্পলিজিরের তারসময় রক্ষার্থে ব্যবহার হয়েছে নানা রেখায়। চিত্রের নিচের দিকে গাঢ় ছায়ায় মাঝে নৌকার ফর্ম এবং ওপরের দিকে বা পাশে গাঢ় রঙের প্রয়োগে চিত্রের রঙের তারসময় রক্ষা করা হয়েছে যথাযথভাবে।
প্রচুর আলো ঠিক পড়ছে সেতুর এক অংশে নৌকা আর পানির ওপর। সমাধিতের ঘন আঘাত পরিবেশ এ আলোই চিত্রটির মূল আকর্ষণ। অ্যাকুয়াটিন্ট মাধ্যমের সর্বোত্তম প্রয়োগে অনন্য শিল্পকর্ম এটি।

‘মাছ ধরার সময়-১’ (১৯৬২) আনুভূমিক বিন্যাসের এ চিত্রটি এটি এই অ্যাকুয়াটিন্ট মাধ্যমে আঁকা। পুনরুদ্ধার বিমূর্ত বিষয়ের এ চিত্রটি মূলত রং রেখা ও ফর্মের সমাহার। সাদা-কালো, হলুদ আর নীলাভ সরুজ রঙের ছান্দসিক বিন্যাসে অক্ষত এ চিত্রটি।

এ চিত্রে সরু ও মোটা লাইন দিয়ে জাল, নৌকার গলুইসহ নানা গড়ন ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। নীলাভ-সরুজে জলের উপস্থিতি এবং হলুদের মধ্যে অসংখ্য বিন্দু যেন বালুময় তটরেখা। নানারোহা ও রঙের সুরেলা উপস্থিতায় নদী-নৌকা, জল মাছের রূপকল্প ফুটে উঠেছে এবং চিত্রটিকে দিয়েছে অন্যমাতা। ‘মাছ ধরার সময়-২’ (১৯৬২), ‘নীলজল’ (১৯৬৪), ‘বিফ্রুক্ত মাছ’ (১৯৬৪) এ রীতিতে আঁকা ছাপচিত।

বিফ্রুক্ত মাছ
আনুভূমিক বিন্যাসের এ চিত্রটি এই অ্যাকুয়াটিন্ট মাধ্যমে আঁকা। এ চিত্রটিও রং-রেখা ও ফর্মের সুরেলা উপস্থাপন। এখানে সরু রেখা দ্বারা জলের উপস্থিতি এবং স্থল রেখা ও অন্যান্য ফর্ম, বিন্দু ব্যবহৃত হয়েছে বিন্যাসের ভারসাম্য রক্ষার্থী। গাঢ় কালোর বিপরীতে সাদা রং দিয়ে আলো-ছায়ার প্রক্রিয়া নির্দেশ করা হয়েছে। হলুদ ও লাল রঙে মাছের রূপদানে এক ধরনের প্রারম্ভমুক্তি ভাব ফুটে উঠেছে, তেজসে পৌঁছাতে সিদ্ধ করে যেন।

এ শিল্পকর্ম প্রসঙ্গে শিল্পসমালোচক সৈয়দ আজিজুল হকের (২০১৩: ৫৩-৬৪) ভাষায় অব্যাহত গুরুত্বপূর্ণ:

‘বিফ্রুক্ত মাছ’ শীর্ষক চিত্রটি নানাদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। জলে আবদ্ধ মাছটির চোখে যে বিক্ষোভের আগন তা তৎকালীন পাকিস্তানি সেনাপতিদের বিক্ষোভ বাংলাদেশের শুধুমাত্র মানুষের অন্তর্দৃষ্টিরই প্রতীকী প্রকাশ। স্মরণীয় যে, মাছ আমাদের জাতীয় ঐতিহাসিক এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। সুতরাং জাতীয় জীবনের প্রাণবন্ধনকে রূপায়িত করার জন্য মাছের এই ব্যবহার চিত্রটিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

এ চিত্রে বিফ্রুক্ত মাছের উপস্থিতিতে বাণ্ডালির সংঘাতী চেতনাকে রূপ দেওয়া হয়েছে এবং রং রেখা ও ফর্মের মাধ্যমে তা ফুটে উঠেছে সার্থকভাবে।
জলের নিনাদ

সফিউদ্দীন আহমদের একটি অ্যাকুয়ারিয়াটিক্স মাধ্যমে করা সর্বশেষ চিত্রের উদাহরণ হলো ‘জলের নিনাদ’ (১৯৮৫), তবে এ চিত্রটি শুধু একটি অ্যাকুয়ারিয়াটিক্স নয়; অতীতে ছাপের প্রায় সকল মাধ্যম অর্থাৎ একটি অ্যাকুয়ারিয়াটিক্স, সুগার অ্যাকুয়ারিয়াটিক্স, মেজোটিস্ট, লিফট গ্রাউন্ড এনপ্যায়েন্ট প্রদর্শিতির সমন্বয়ে চিত্রটির রূপ দেওয়া হয়েছে।

বন্যার শৃষ্টিকে ভর করে শিল্পী এ চিত্র নির্মাণ করেন। বন্যার অভিজ্জাত মনে তাঁর মজাগাত। বন্যার পানিতে বৃষ্টির ফেটায় যে আবহ তৈরি হয় তা তিনি প্রত্যাশ করেছেন, অনুভব করেছেন, অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাঁর তখন থেকেই তিনি এরন একটি শিল্পকর্ম সৃষ্টির পরিকল্পনা করেন। ১৯৫৯ সালে প্যারিস ভ্রমণ এবং আরো পরে সত্যরেখা শহরের সময় অ্যারক্সট্রার সুর শোনেন, যে সুর তাঁকে এ চিত্র রচনার প্রেরণা দেয়। অ্যারক্সট্রার বাজাতে প্রয়োজন হয় অনেক তথ্যে; এবং ব্যবহৃত হয় নানা বাদাম্বস্ত্র। অ্যারক্সট্রার সুর কখনো নিন্দিমার আবার কখনো উৎসাহিতি হয়ে সর্বোচ্চ পর্যায়ে ওঠে। অ্যারক্সট্রার এ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করে অন্তর্লিন ছাপচিত্রের সকল মাধ্যমান্ত একটি করে প্রায় তিন বছরের সাধারণ চর্চা করেন ‘জলের নিনাদ’ শৈল্পিক এ শিল্পকর্মটি। (রৌহিত্য আজিজুল, ২০১৩: ৫৬) পুরোপুরি বিমূর্ত রীতির আন্তর্ভুক্তিমূলক বিনাসের এ চিত্রটির পুরো জমিন জুড়ে রয়েছে পানির ফোটা, পানির প্রায়। পানির এ ফোটাগুলো দেখে মেশে থেকে সুর হয়ে রয়েছে। চিত্রটিতে মাছ ধরার আবহ ফুটে উঠেছে। ফলে জল, মাছ, নৌকার ফর্ম ব্যবহার করা হয়েছে। পুরো চিত্র জুড়ে হালকপ সুখের আবহ এবং তার ওপর অফহোয়াইট রঙের পানির ফোটা সদৃশ বুট।

এ চিত্রটি প্রথমে শিল্পী সফিউদ্দীনের কাছে এবং সিদ্দির একটি বড় ঠিকানা। সমীক্ষার চিত্রকর্তা তাঁর কোনো নাম কেনা অনুযায়ী নেই।... চিত্র তাঁর শুধু উপাদান রেখায়, বর্ণপ্রাত, যথাযানাম বিন্দু, মন থেকে উৎসাহিত শ্রীধর্ম গড়ন — এই সব মিলে হয় আকৃতি করা অ্যারক্সট্রা। বৃটির ধরন অনিয়মিত অনেকভাবে। বৃটির ফোটা বিভিন্ন বুটতে পড়ে বিভিন্ন রঙের শব্দ কথা বলে। জলের ওপর জল পড়ে শব্দ হয়। কড়ি ও কোমলের অন্তরের সিরকনি হয়ে ওঠে শেষে। বর্ণপ্রস্তাবলগুলো আরো আরো কোনো রেখায় দেখে দেখেছেন শিল্পী। এই মেশেগুলো দেখলে মনে হয় আত্মীয় দিয়ে একটি টান দিলে মন মেজে উঠবে। সফিউদ্দীনের জাল, নৌকা, মাছ, জল সবকিছুর সমন্বয় করেছে সাগরতিক ইশারায়। এই মাত্রা যোগজনে আমাদের চিত্রকলা সমৃদ্ধতর হয়েছে।
এ চিত্রে শিল্পীর কারিগরি কুশলতা বা নিপুণতা সর্বোচ্চ পর্যায়ের, যার ফলে সৃষ্টি হয়েছে
এক অনবদ, মনোগ্রাহী সার্থক শিল্পকর্ম।

কপার এনগ্রেঞ্চিং চিত্র

সাধারণ ধাতবপাত তথা কপারের পাতে ব্যবহারের সাহায্যে নানা ধরনের রেখা কেটে
ছাপ নেওয়ার পদ্ধতি হলো কপার এনগ্রেঞ্চিং। (Ian Chilvers, 2012: 204) এ
প্রক্রিয়ায় ছাপচিত্র নির্মাণে শিল্পীর প্রচুর তর্ক করে দক্ষতার প্রয়োজন, কেননা ধাতবপাতে
আঁচড়াইহৃত রেখাটি চুরান্ত হয়ে যায়। খোদাইকৃত রেখা মোচনের কোনো সুযোগ থাকে
না। এ মাধ্যমে শিল্পী সফটউইন্ডের দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। এ মাধ্যমে
শিল্পীর উদ্রেখনযোগ্য শিল্পকর্ম ‘জেলের স্থপ্ত’ (১৯৫৭), ‘হলুদ জাল’ (১৯৫৭), ‘গুনটানা’
(১৯৫৮), ‘কানা’ (১৯৮০) প্রভৃতি।

জেলের স্থপ্ত

‘জেলের স্থপ্ত’ কপার এনগ্রেঞ্চিং মাধ্যমে আঁকা প্রথম ছাপচিত্র। অনুভূমিক বিন্যাসের এ
চিত্রটি মূলত রেখার খেলা। বিমূর্ত ধারার এ চিত্রটির মাঝে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে জেলে,
নৌকা ও মাছের রুপকল্প ফেজেচুর, একদম অচেনারুপে।

রেখার রিদমিক বা ছাড়াদিক ব্যবহার এ ছবির মূল বৈশিষ্ট্য। একটি রেখা উঠে গেছে
আরেকটি রেখার ওপর, মূর্ত পূর্বের রুপ পরিবর্তিত হয়ে নতুন আরেক রূপ বা গড়ন
সৃষ্টি হয়েছে। রেখাগুলো কোথাও সর্বোচ্চ, কোথাও সর্বনিম্ন আকার কোথাওবা
রেখিক। অর্থাৎ রেখার বহিভঙ্গিমতা এ চিত্রের আরেকটি বৈশিষ্ট্য।

চিত্রের ভিত্তিভূমি বা সারফেস ফ্লাইট বা পুরোপুরি সমতলীয় রঙ ব্যবহৃত হয়েছে।
পুরোপুরিয় জুড়ে বার্ট সিয়েনা রঙের মাধুর্য লক্ষ করা যায়। বার্ট সিয়েনা রঙের বিপরীতে
রেখাগুলো আরো বেশি স্পষ্টভাবে ধরা দিয়েছে। চিত্রের কেন্দ্রভূমিতে পুরোপুরি বিমূর্তভাবে
জেলেকে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং তাকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে যে রেখাসমূহ রেখায়
রয়েছে তার স্পৃহার নৌকা ও মাছের অবয়ব। রঙ ও সীতল রেখার বিন্যাসে কপারের বুকে
আপুনিক কবিতার মতো এ ছবির রূপকল্প, যা ফুটে উঠায় সার্থকভাবে।

হলুদ জাল

‘হলুদ জাল’ (১৯৫৭) চিত্রের রয়েছে তিনটি ভাষা; চুড়ান্ত ভাষ্যটি আমাদের আলোচ্য
বিষয়। বুন্টের আধিকারিক পুনর্নির্মাণের এ চিত্রটির মূল বৈশিষ্ট্য। কপার এনগ্রেঞ্চিং
ও সফটউইন্ড মাধ্যমে আঁকা এ চিত্রটিতে অক্ষিত হয়েছে নানা গতিময় রেখা।
ধ্যান পাতের ওপর সফট্যাউয়ারের মাধ্যমে মশারি, মোজা, ব্যাডেজের কাপড় ব্যবহার করে জালের আবহ সৃষ্টি করা হয়েছে। কাপড় যেখানে একাধিকবার ব্যবহার হয়েছে সেখানে সৃষ্টি হয়েছে ঘনবুন্দ। জালের মাঝে সৃষ্টি করা হয়েছে নৌকার রূপকল্প। চিত্রের বামদিকে রঙের গাঢ়তা আর বুনটের ঘনত্ব লক্ষ করা যায়, তবে ডানদিকে বুনটের মাটি হালকা করা হয়েছে বিন্যাসের বিষয়টি মাঝায় রেখে।

চিত্রের পুরোভূমিতে হলুদ, কমলা, সবুজ আর কালোর রঙের প্রোয়াগ লক্ষ করা যায়। সফট্যাউয়ারের মাধ্যমে বুনট বা টেক্সচার তৈরিতে শিল্পী অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। রঃ, রেখা আর বুনটের মিশেলে চিত্রটি হয়ে উঠেছে অনেক বেশি দৃষ্টিগ্রহণীয়।

পুটানা

‘পুটানা’ (১৯৫৮) — সমবিমূর্ত ধারার এ চিত্রটিতে রেখার বহুভূমিক ব্যবহার গতিময় অবস্থায় রূপ দেওয়া হয়েছে। একটি রেখা যেন একে-বেকে, দুমাটঝ-মাটচে রূপ নিয়েছ দুজন মাঝির - যারা প্রচুর শক্তি দিয়ে প্রাথমের বিপরীতে টেনে নিয়ে চলছে নৌকা। প্রাথমের প্রতিকূলে দাঁড় টানার জন্য প্রয়োজন হয় গতির, এই গতির প্রশস্তানী এ চিত্রের মূল বিষয়।

এ চিত্র রচনায় আধুনিক ছাপচিত্রের জনক বিশ্বখ্যাত চাপচিত্রী ডেলিউ হোটারের প্রভাব লক্ষ করা যায়। (সৈয়দ আজিজুল, ২০১৩: ৪২) নিজ জীবনের সংঘায়মান অথবা অথবা তার নিরবচ্ছিন্ন করার জন্য প্রতিমায় তাকে যে বল প্রোয়াগ করতে হয়েছে সেটাই এখানে গতির্ভূতের উপস্থাপন করার জন্য। (সৈয়দ আজিজুল, ২০১৩: ৬০) সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে শিল্পী নিজ জীবনকেই টেনে নিয়ে গেছেন। চিত্রের বহুভূমিক রেখা যেন জীবনের নানা প্রতিকূলতার, বাধা বিপর্যয় আর এসব কিছুকেই উপস্থাপন করে সামনের পথ চলা। তবে এর জন্য প্রয়োজন প্রচুর মানসিক শক্তি। শিল্পী যেন তাঁর নিজ জীবনের অভিজ্ঞতার চিত্ররূপ দিয়েছেন সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে। সরু ও মোটা রেখার সময়ে সৃষ্ট এ ছাপচিত্রটি কপার এনাগ্রাফিংয়ের অন্যতম শিল্পকর্ম।

কান্না

‘কান্না’ (১৯৮০) — আধুনিক বিন্যাসে কপার এনাগ্রাফিংয়ের এ চিত্রটিতে বেশ কিছু চোখ আঁকা হয়েছে। এ চিত্রটিতে বহুভূমিক রেখা আঁকা হয়েছে - রেখা কখনও সরল, কখনও রুইক্ষি, কখনও সরল, কখনও স্থল আবার কখনও ভর্তবালকার। চিত্রে যেমন নানা ভঙ্গির রেখা আঁকা হয়েছে তেমনি রূপ দেওয়া হয়েছে বিচিত্র ধরনের চোখের আকৃতি। চিত্রের কেন্দ্রভূমিতে আঁকা হয়েছে বিকাশ্য চোখের আদালতে; যে চোখে কেন্দ্র করে আর্টিস্ট হয়েছে অন্য চোখগুলো। চিত্রের কেন্দ্রভূমিকে আলোকিত করে তোলা হয়েছে এবং পূর্বের মুখ ছুঁড়ে রয়েছে তামাটে বর্ণের এলগ্রে।
এ চিত্র প্রসঙ্গে সৈয়দ আজিজুল হক (২০১৩: ৬১) বলেন:

কান্না শিকারের চিত্রটিতে শিক্ষী মুলত একেছেন ‘ঝরঝর চোখ’। যে ঝরের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে দুর্গাপুর্ণ, দুর্গাপুর্ণ ও কান্নার উৎবন্দ, ঝরের সত্যতার একটা চোখ থাকে...

সেই চোখকে কেন্দ্রে করিয়ে ঝর্ডুটি অবচিত হয়, কপাল শক্তি অর্জন করে এবং পরিপূর্ণে সর্বনাশে আপন হেন প্রকৃতি ও লোকালয়ের প্রভূত ক্ষতি সাধন করে। ঝরের এই চোখটিকেই শিক্ষী এ চিত্রে রূপময় করেছেন। চিত্রটির 'কান্না' নামের সার্থকতা এখানেই যে, ঝরের ওই চোখের মধ্যে নিহত থাকে অগ্নিতম মানুষের কান্নার উত্স।

কপালের বুক চীরে গতিময় রেখার রূপায়ণ ও বিন্যাসের দক্ষতায় চিত্রটি নান্দনিক ভাবনার উদ্দেশ্য করে।

একুশে স্মরণে

সফিউদ্দীন আহমেদ মুক্তিযোদ্ধা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনাশীলী বেশ কয়েকটি হাত আঁকেন। ১৯৮৭ সালে মুক্তিযোদ্ধার ভিত্তিভূমি ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে আঁকেন ‘একুশে স্মরণে’ চিত্রটি।

কপার এনেগ্রাফিং-এ ছাপা হলেও ছাপ নেওয়ার পর চিত্রে পেশিলের মাধ্যমে কিছু টোন দেওয়া হয়েছে। আমরা জানি, ছাপচিত্রের ক্ষেত্রে সফিউদ্দীন আহমেদ একজন বিশ্ববাদী শিল্পী। ছাপ নেওয়ার পর তার ওপর হাতের কোনো কাজ করা তার নীতিশীলী। কিন্তু এ চিত্রের ক্ষেত্রে তিনি সে নীতিতে অটল থাকতে পারেননি। চিত্রের প্রয়োজনেই তিনি গ্রিন্ট নেওয়ার পর তাতে কিছু টোন দেন। ফলে চিত্রটি পরোপরি ভর্ত্তর্ক্ষণ ছাপ না হয়ে কিছুটা মিশ্র মাধ্যমের পর্যায়ে চলে গেছে। এ চিত্রে গ্রাফাইলের মধ্যে কিছু মুখায়ব আঁকা হয়েছে এবং এ মুখায়বকে ঘিরে ছড়িয়ে রয়েছে নানা ফর্ম – চোখ, চোখের জল সহ অনেক রেখা। চিত্রের ভিত্তিভূমিতে আঁকা হয়েছে করেকটি প্ল্যাকার্ড, ভান দিকে রয়েছে ঘরবাড়ির আদল, ধারণা করা যায় এটি মেডিকেল কলেজ ভবনের গেট। এসব প্রতীকী উপস্থাপন আমাদের মনে করিয়ে দেয় ১৯৫২-এর একুশে ফেডারেশনকে, মনে করিয়ে দেয় ভাষা শাহীদের আত্মত্যাগের কথা। সাদা-কালো রেখার উল্লেখ বিন্যাসের এ চিত্রটিতে ‘মুক্তির অভিজ্ঞতাকে বিষয়ের বাংলা, অকৃত্রিম প্রকৃতির মাধ্যমে এক বস্ত্রিত জনগণীয় সকাতর বিকল্পের রূপকেই চিত্রায়ণ করা হয়েছে।’ (আজিজুল, ২০১৩: ৬২) এখানে উল্লেখ যে, ‘একুশে স্মরণে’ নীরব ছাপচিত্রের আরো দুটি ভাষা রয়েছে – যে চিত্র দুটির ওপর চারকল, ক্রমে, পেশিলের মাধ্যমে ইমেজের পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে যাকে মিশ্র মাধ্যমের রেখাটির হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এ চিত্র দুটির বিষয় ও আঞ্চলিক নির্দেশ প্রসঙ্গে সৈয়দ আজিজুল হক (২০১৩: ৩০) বলেন:
একটি মন্ত্রকে ধরে নানা চোখের বিন্যাস, তাতে আছে অক্ষ, আছে বেদনা, আছে ভাষা ও দেখার প্রতি তীর-গাঢ়-গভীর মমতা ও অনুরাগ। ছাপচিত্রের এই রূপ থেকে সৃষ্টি রেখাচিত্রের মধ্যে 'একুশে স্মরণ-১'-এ চিহ্ন-ভাবনা-কেন্দ্রকে করা হয়েছে অত্মুক্ত। এবং 'একুশে স্মরণ-২'-এ করা হয়েছে বহিঃমুখী অর্থাৎ বিভিন্নকাঠামো ভাবনাকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বাইরে। ছাপচিত্রের কোনো কোনো ইমেজকে যুক্ত দিয়ে নতুন ইমেজ গঠন ও চিত্রগুলি টেরিনাল আবেদন সৃষ্টির মাধ্যমে রেখাচিত্র-দুটি প্রকাশ করেছে সম্পূর্ণ নতুন, স্বতন্ত্র এক আবেদন।

একাদশীর স্মৃতি

শিশু ১৯৮৮ সালে কপার এলন শিভি-এ আমেন 'একাদশীর স্মৃতি' শীর্ষক চিত্র। এ চিত্রেও দেখা মেলে চোখ ও চোখের জলের বিচিত্র গভীর। সৈয়দ আজিজুল হকের লেখা থেকে আমরা জানতে পারি, যে, শিশুর এ চিত্র রচনার পেছনে রয়েছে একাদশীর ভাববহ দিনগুলির স্মৃতির তাড়না। চাঁদ শহরের সময় দেখা যখন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বর্বরতাতিত তাড়নে পিপড়, এমনই শুকনায় অবস্থায় কারফিউয়ের মাঝে বাহিবারে পাকিস্তানীর আগমন ঘটে। পাকিস্তানারা একের পর এক বাড়ি তলাশি করলেও ঠিক করেই শিশুর বাড়ির এক বাড়ি আছে এসে থাকে যায়। শিশুর স্ত্রীক তাদের বাড়ির জন্য বাড়ির বাড়ির একটি আবার এসে থাকে যায়। (সৈয়দ আজিজুল, ২০১৩: ৬২) শিশুর চিত্রের বিদ্যমান হয়েছে ভয়ানক শক্তির চোখের চাহনি। উল্লব বিন্যাসের এ চিত্রের সমস্ত পট জুড়ে ছড়িয়ে আছে অস্ত্র দেখে। কোনো চোখ কোনো বিক্ষিপ্ত, কোনোটিতে হতাশ, বিজ্ঞান আবার কোনো চোখ অস্ত্রপূর্ণ। মানুষের মনের অভিব্যক্তি প্রকাশ পায় চোখের ভাষায়, মানুষের আবেগ ও আবাদেনোলা ভাষা লাভ করে। ধ্রুকি ও রোমান জাহাজগুলো সবসময় চোখে গভীর বহন করে যে বিশ্বাস থেকে তা হলা, যে কোনো প্রকার কুস্তিতি থেকে এই চোখের তাদের জাহাজকে রক্ষা করতে। (শরীফ, ২০০৬: ৮০) ‘সফিউদ্দিনের চোখকুস্তি ফর্মগুলো... রূপ নিয়েছে বিভিন্ন তাত্ত্বিক উপস্থাপন রুপক ও প্রতীক হিসেবে - কথনো নীরব প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে, কখনো বিদ্রোহের, বিপ্লবের, ক্রোধের, আক্রমণের সোচার প্রতীকীরূপে; আবার কখনো বা আলোর উত্তর কিংবা আনন্দ-বেদনা ও বিজ্ঞান-উল্লাসের মূর্তিমান প্রতীক হিসেবে।’ (আব্দুল মতিন, ২০১২: ৩২) হতে পারে সফিউদ্দিন আহমেদের এ চিত্রের চোখের জাহাজ বাঙালির চোখ। সমস্ত চিত্র জুড়ে ব্যাপিত রঙের বহন থাকে যায়। তবে রেখাগুলো বাঁটি সিয়েনা রঙের সাথে কালো মিশিয়ে রঙের মাটি আরো গভীর করা হয়েছে। চিত্রগুলির মাঝের আলোর প্রবাহ লক্ষ করা যায়। এ আলো নতুন আলো, সন্নাত সেলামের বার্তা বহন করে। সমস্ত চিত্রে ছড়িয়ে থাকা আলোকজ্ঞতা চোখে অঙ্গীরনার বিপ্লবকে আরো তীব্র করে তুলেছে সে ক্ষেত্রে এই আলো নতুন সূর্যোদয়ের প্রতীক হয়ে চিত্রে সুখ-দুঃখের ভাবাস্তা সৃষ্টি করেছে। মূহুভাবিত বলিশিবিরের ভাববহতা যে চিরহায়িনী নয়, অক্ষরকের অবসান অবশ্যাচারী
এই আলো সেই ইচ্ছিত বহন করে। রং ও রেখার ব্যবহার শিল্পীর দক্ষতার পরিচয় মেলে। ’৭১-এর বিকৃতি সময়ের প্রকাশ ঘটেছে এ চিত্রের মধ্য দিয়ে।

একাত্তরের স্মরণে

শিল্পী একাত্তরের স্মৃতিকে ভর করে ২০০২ সালে আকনে ‘একাত্তরের স্মরণে’ শীর্ষক চিত্র। এ চিত্রটিও কপাল এনামেলিং-এ ছাপ। এ ছাপচিত্রটির চারটি ভাষা দেখতে পাই।

তবে আমরা ধারণা করি যে, এ ছাপগুলো মূলত চূড়ান্ত ছাপের পূর্ববর্তী পর্যায়। কারণ আমরা জানি যে, একটি ছাপচিত্র নির্মাণ করতে হলে কয়েকটি পর্যায় এবং ধাপ অতিক্রম করে চূড়ান্ত ছাপটি পাওয়া যায়। এ চিত্রের ক্ষেত্রে সে রকম পর্যায়পরিবর্তন কয়েকটি ধাপ লক্ষ করি। প্রথম চিত্রটি থেকে দ্বিতীয় চিত্রটি লাইনের কিছু আধিকা লক্ষ করা যায়। এর মধ্যে রয়েছে তৃতীয় ও চতুর্থ ছাপের পর্যায়ে তারতম্য লক্ষ করা যায়। চূড়ান্ত ছাপে এসে রঙের গাঢ়তা একেবারে কম দেখা যায় এবং ছাপটি হয়ে ওঠে রেখা প্রদান।

প্রথম দুটি ছাপে পূর্বরে চিত্রচিত্র আলোকিত হলেও তৃতীয় ও চতুর্থ ছাপে চিত্রচিত্রের মধ্য দিয়ে শুধু আলো প্রবাহিত। তৃতীয় ও চতুর্থ ছাপে সমুজ্জী রং ব্যবহার করা হয়েছে, শুধু রঙের গাঢ়তা তারতম্য দেখা যায়। উল্লিখিত নায় এ চিত্রটির কেন্দ্রীয় একটি মূলাঙ্গ লক্ষ করা যায়, যা সমন্বয়শীলিক আত্মপ্রকাশ। এ চিত্রটিতেও নানা রকম চোখের গড়ন লক্ষ করা যায়। অশ্রুতে ভিজে আছে পূর্ব চিত্রটি। এ অশ্রু সারা বাংলার মানুষের। সমস্ত আলোটাই গিয়ে পড়েছে অশ্রুসিক্ত বিষাদে ভরা শিল্পীর মুখার্যের ওপর, যেন দর্শকের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় সেখানে এবং হৃদয় দিয়ে অনুভূব করতে পারে একাত্তরের শোকবহৎক।

সেয়াদ অমিতজুল হক এ চিত্রে প্রসঙ্গ বলেন, ‘মুখার্যের বাইরের ওই দুই চোখ একটি বার্তার বন্ধ করে, তা হলো: চোখ থেকে অশ্রুপাতের বিষয়টিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ব্যক্তি থেকে সমাটিতে, বিশেষ থেকে নির্বাপষে।’ (২০১৩: ৬৪) রং-রেখার সুসংগঠন ব্যবহারে চিত্রটি হয়ে উঠেছে সার্থক।

শিল্পী সফিউদ্দীনের কাজে সমিলন ঘটেছে গীতির সাধনা ও মননশীলতার, করণকৌশলগত নিযুক্তি ও নামনির্মাণ। নিরস্তর নিরীক্ষাপ্রধান সফিউদ্দীনের নিজের ভাষায় - ‘আমি বাংলাবাদ ফেইলিওর হয়েছি। আর যখনই ফেইলিওর হই তখনই আমার জিদ বেড়ে যায় - অবাদ চেটা করি, কিছু কিছু এগিয়ে যাই। আমি সেই কাজ করতে চাই, যাতে আমি থাকবো - যাতে আমার দেশ থাকবো।’ (সফিউদ্দীন, ১৯৮৮: ২৫৫) শিল্পীর মনোবাসনার সার্থক প্রতিফলন ঘটেছে তার শিল্পকর্মসমূহে। শিল্পীর তার শিল্পকর্মের মানেই বেঁচে থাকবো দীর্ঘকাল।
সফিউদ্দীন আহমেদ-এর উল্লেখযোগ্য ছাপচিত্র

চিত্র: ০১। ‘কৃষকের মুখ’, ১৯৪২

চিত্র: ০২। ‘ঘরে ফেরা’ বা ‘বাড়ির পথে’, ১৯৪৪

চিত্র: ০৩। ‘সাঁওতাল রমণী’, ১৯৪৬

চিত্র: ০৪। ‘মেলার পথে’, ১৯৪৭

চিত্র: ০৫। ‘গুটানা’, ১৯৫৫

চিত্র: ০৬। ‘বন্যা’, ১৯৫৬
চিত্র: ০৭। ‘শালবন ও মহিষ’, ১৯৪৪

চিত্র: ০৮। ‘ময়ূরাক্ষী তীরে দুই নারী’, ১৯৪৫

চিত্র: ০৯। ‘শাক্তিনিকেতনের দৃশ্যপট’, ১৯৪৫

চিত্র: ১০। ‘ময়ূরাক্ষী’, ১৯৪৫

চিত্র: ১১। ‘পারাবত’, ১৯৪৫

চিত্র: ১২। ‘মাছ ধরার সময়’, ১৯৫৭
চিত্র: ১৩। ‘নেমে যাওয়া বান’, ১৯৫৯

চিত্র: ১৪। ‘সেতু পারাপার’, ১৯৫৯

চিত্র: ১৫। ‘মাছ ধরার সময়-১’, ১৯৬২

চিত্র: ১৬। ‘বিক্ষুদ্ধ মাছ’, ১৯৬৪

চিত্র: ১৭। ‘জলের নিনাদ’, ১৯৮৫

চিত্র: ১৮। ‘জলের স্পুল’, ১৯৫৭
চিত্র: ১৯ | 'হলুদ জল', ১৯৫৭
চিত্র: ২০ | 'ছণ্টান', ১৯৫৮

চিত্র: ২১ | 'কাল্পনা', ১৯৮০
চিত্র: ২২ | 'একুশে স্মরণ', ১৯৮৭

চিত্র: ২৩ | 'একাত্তরের স্মৃতি', ১৯৮৮
চিত্র: ২৪ | 'একাত্তরের স্মরণ', ২০০২
১৩৬ সাহিত্য পত্রিকা

ক. গ্রন্থ

আবুল মনসুর, ২০১৬। শিল্পকলা ও শিল্পকলাগুলি, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা।
কমল আইচ, ২০০৯। শিল্পের চিত্রকর্ম সম্পাদন, করণী প্রকাশনী, কলকাতা।
বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, ১৯৭৪। চিত্রশিল্প: বাংলাদেশের, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
রফিকুন নবী, ২০১৬। দেশের সকল শিল্পকলা, প্রথম প্রকাশন, ঢাকা।
শেখন সেম, ২০১৬। বাংলার চাপচিত্রকলা ১৮১৬-১৯৪৭, সহজপাঠ ও যাপন, কলকাতা।
শামসুজ্জাহান খান, ২০১৩। বাংলাদেশের উৎসব, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।
শরীফ আতিক-উজ-জামান, ২০০৬। দশ পরিকৃতি চিত্রশিল্পী চূড়া, ঢাকা।
সৈয়দ আজিজুল হক, ২০১৩। সফিউদ্দিন আহমেদ, বেঙ্গল পাবলিকেশন, ঢাকা।


Syed Azizul Haque 2011. ‘A pilgrim’s quest for art’, Rosa Maria Falvo (edt.), Safiuddin Ahmed, Skira, Italy; Bengal Foundation, Dhaka.

খ. প্রবন্ধ

আবুল মজিদ সরকার, ২০০২। ‘চাষের ছবিতে চোখ’, আবুল হাসানাত সম্পাদিত, কালি ও কলম, (সফিউদ্দিন আহমেদ সংস্থা) ৯ম বর্ষ পঞ্চম সংখ্যা।

আবুল বারক আহুরী, ২০১২। ‘স্ক্যাব্লার সাধক: শিল্পকর্ম সফিউদ্দিন আহমেদ’, আবুল হাসানাত সম্পাদিত, শিল্প ও শিল্পী, ২৫ বর্ষ, ১ম সংখ্যা।

মাহমূদ আল জামান, ২০০২। ‘পরিপূর্ণ এক শিল্পী মানুষ’, আবুল হাসানাত সম্পাদিত, সফিউদ্দিন আহমেদ, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা।

রফিকুন নবী, ২০০২। ‘শিল্পের অনন্য সাধক’, আবুল হাসানাত সম্পাদিত, কালি ও কলম, (সফিউদ্দিন আহমেদ সংস্থা) ৯ম বর্ষ পঞ্চম সংখ্যা।

শোভাস সেম, ২০০৭। ‘সফিউদ্দিন আহমেদ’, লাল রুথ সেলিম সম্পাদিত, চারু ও কারু কলা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।